ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 779-785
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.289

আধুনিক গণতন্ত্রের সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

ড. অমিত কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.03.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Today, the crisis of democracy has become evident all over the world. Even after following certain administrative methods in modern democracy, public opinion is not being properly reflected at the ballot box. Market economy or capitalist economy and state-terror have become the main obstacles to proper reflection of public opinion. However, direct democracy was prevalent in ancient Greece, in the small city-states of Rome, among the Teutonic tribes of the first century AD, and in the ancient cantons of Switzerland. These were non-party democracies. In that case, the will of the majority was accepted as the will of the general public. The ancient 'GAN' or 'Association' of India were examples of direct democracy. Rabindranath planned his 'Swadeshi Samaj' from a somewhat similar place of thought. Rabindranath's plan for 'Swadeshi Samaj' was an inevitable result of the fact that in subjugated India, political independence was not so active and outside state initiative and control. His 'Swadeshi Samaj' was an almost autonomous organization outside state terror or control—where the majority could be reflected. In contrast to helpless surrender to market economy or capitalism, Rabindranath's social reform or economic thought was an alternative attempt to search for a democratic or humane face of development.

Keywords: Crisis of Democracy, 'GAN' or 'Association', Direct Democracy, 'Swadesi Samaj', Capitalist Economy, Economic Thought of Rabindranath

সমাজকর্মী ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অস্বীকার না করলেও অত বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না, যে কারণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বতন্ত্র গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুদৃঢ়ীকরণ চেয়েছিলেন। এর মধ্যে কেউ কেউ ইউটোপিয়ান চিন্তাধারার নিদর্শন খুঁজে পান। সে আসলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস চেতনার অপরিপক্কতার ফসল। সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিকতার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আর আজকের দিনে গণতন্ত্রের সংকটকে স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাসে গণতন্ত্র কিন্তু খুবই প্রাচীন একটি সিস্টেম বা মতবাদ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা Direct Democracy প্রাচীন গ্রীসে, রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর টিউটন উপজাতিদের

মধ্যে, সুইটজারল্যান্ডের প্রাচীন ক্যান্টনগুলিতে প্রচলিত ছিল। এগুলি ছিল দলহীন গণতন্ত্র। সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাই সেক্ষেত্রে সাধারণের ইচ্ছা বলে গৃহীত হোত।

ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি 'গণ' বা 'সংঘ' নামে পরিচিত ছিল। এদের আসলে বলা যায় ক্ষত্রিয় কূলের স্বয়ংশাসিত অভিজাত সাধারণতন্ত্র। ক্ষত্রিয় জাতির সভ্যরাই ছিল এর প্রভু। ভারতের প্রাচীন 'গণ' গুলি ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিদর্শন। এদের কিছু ছিল একক সংঘ, কিছু ছিল মিলিত সংঘ। গৌতম বুদ্ধের সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও পঞ্চম শতাব্দীতে বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং কুশীনগরে মল্লরা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। মৌর্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ। লিচ্ছবি ও মল্লরাজের আদর্শ বৌদ্ধসংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভাবনা ভারতে অপরিচিত নয়।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা গড়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। এতে গণ কেবল ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আইন প্রণয়ণ বা শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে এ জাতীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এরপর বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে মার্কস গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তোলেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যস্থতায় শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য হয়। আধুনিক কালে গণতন্ত্র যে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা সে বিষয়ে মার্কসীয় বা অমার্কসীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা একমত। আমাদের দেশে ১৯৪৯-এ সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সূচনা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানটি গড়ে ওঠে Government Of India Act 1935 অনুসারে— যেটি আসলে বৃটিশদের রচনা। সেই হিসেবে আমাদের দেশের সংবিধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ফসল।

আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম হয় বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ ও একাধিক রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্র বিকাশের এই প্রাথমিক শর্তগুলি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরিকাঠামো হয়ে থাকেনি। ব্রিটেন ও ইউরোপের কিছু দেশে তাই রাজতন্ত্র বজায় থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন বিঘ্ন ঘটেনি। রাজতন্ত্র সেখানে গণতন্ত্রের অধীন। কিন্তু আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সিংহাসনের অধিকারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাদখলের লড়াই বা পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বহমান থেকেছে, রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি এই ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস।

সমাজের উপরতলার এই বিরোধের জটিল বিশৃঙ্খল প্রকাশ কিন্তু ভারতের বৃহৎ গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। ফলে এদেশের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার কোন অবকাশ পায়নি। উনিশ শতকে এদেশে বাংলায় রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রেনেসাঁ-প্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ, মানবিকতাবোধ সেখানকার দেশগুলির শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্য দর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যেমন চেতনাসংস্কারের কাজ করেছিল এদেশের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। বাংলার নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁ এদেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। ফলে ভারতের গণতন্ত্র ইউরোপের গণতন্ত্রের মতো নিজস্ব চেষ্টায় কোনো হয়ে ওঠা ব্যাপার নয়— বাইরে থেকে আরোপিত।

তাছাড়া দলতন্ত্র আমাদের দেশের মতো ইউরোপীয় গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেখানকার দলগুলি একই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তাদের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব

তাকে বলা চলে 'Non-Antagonistic'। কোন গুণগত পরিবর্তনের কথা তারা ভাবতে পারে না। সেখানে দলপ্রথা পদে পদে শ্রেণিবৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য, ভাষা তথা সাংস্কৃতিক বৈষম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, গণতন্ত্রে সংকটকে ঘনিয়ে তোলে না।

কিন্তু ভারতে এর বিপরীত ছবিটি দেখা যায়। তার সঙ্গে রয়েছে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রশ্ন, অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন, শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন। এই বৈষম্য ও বিরোধ এদেশের গণতন্ত্রকে, তার রাষ্ট্রিক কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলছে। আসলে এই বিরোধ আর বৈষম্যকে ভিত্তি করেই এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম সংকট বয়ে আনে। ভারতের দলপ্রথার চরিত্রলক্ষণই ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যেখানে নিয়ন্ত্রক শক্তি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠই সত্য— এটা মেনে নিতে হয়। যে দেশে অশিক্ষার হার বিপুল, সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার কখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি ইত্যাদি সংস্থার নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। জীবনের সকল বিভাগের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য, নিজেদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে জনসাধারণের সম্মতি অর্জনের জন্য এরা যে পন্থা অবলম্বন করে তা হল অযৌক্তিক প্রচারকার্য— যা স্বার্থবাহী, আদর্শবাহী নয়। তাই এদেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত। যাঁরা গণতন্ত্রকে একটি ভাবাদর্শ বা জীবনপন্থা বলে ভাবেন, তাঁদের কাছে গণতন্ত্র একটি সর্বব্যাপী জীবনদর্শন। জীবনের রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সবকিছুই এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার কয়েকটি পূর্বশর্ত আমাদের মানতে হবে। শিক্ষিত সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সেই সাথে পরমতসহিষ্ণুতা হল পূর্বশর্তগুলির অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা এইসকল পূর্বশর্তগুলির পূরণের ব্যাপারেই অধিক জোর দিয়েছিলেন। কেননা তা না হলে গণতন্ত্রের সাফল্য অধরা থেকে যায়, সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি বা সংকট রবীন্দ্রনাথের কাছে যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা তাঁর রচনাগুলিই সাক্ষ্য দেয়। বিটিশ শাসনতন্ত্রের কাঠামোটি যে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বেমানান তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। সে কারণে বিকল্প এক গণতন্ত্রের খোঁজ তাঁকে করতে হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ছিলেন না এমন কথাও কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন।

১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় নেশন তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সমাজপ্রধান সভ্যতার গুণগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ স্বার্থপরতার সংঘাতে দেশীয় স্বার্থপরতা অর্থাৎ নেশন বা 'পলিটিক্যাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়'-এর উদ্ভব অনিবার্য জেনে দেশের মানুষকে সাবধান করতে চেয়েছেন। 'সমূহ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'দেশের কথা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— 'যাহা হউক আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে— কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে— আমাদের চিত্তকে আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ ব্যাখ্যা করে অশোক সেন তাঁর 'রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'নেশন', 'ন্যাশনাল' নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকের তখন প্রবল উৎসাহ। আন্দোলনেও তাঁরাই তৎপর। দেশজোড়া বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় তারা নেহাত ছোটো এক অংশ, নিজেদের অবস্থার সঙ্গে অনেকের বিরাট ব্যবধান। দাবিদাওয়ার পরিসরও নিজেদের স্বার্থে সীমাবদ্ধ। তাই 'নেশন' কথাটির

সঙ্গে কোনো সর্বহিতের সম্ভাবনাকে, সার্বজনিক ধ্যানধারণার তাৎপর্যকে মেলাতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। এমনও ভেবেছেন তিনি, যে 'জাতীয়' শব্দটির প্রয়োজনে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, আরো সব ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের বাস্তব মুছে ফেলবার আশঙ্কা আছে, তার সঙ্গে কোনো শক্তিশালী অংশে যদৃচ্ছ আধিপত্যের অভিলাষ জুড়তে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভারতব্যাপী বিস্তার তৈরি করেছে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির ঐক্য। সেখানে অজস্র পার্থক্যের মধ্যে কোনো সজীব সামঞ্জস্যের পরিচয় নেই। সারা দেশে সে অভিজ্ঞতার ক্ষয়ক্ষতি কত বিপুল ও ব্যাপক তার জানাশোনাও সমানে বাড়ছে। স্বদেশের এই মর্মান্তিক বাস্তবকে বাদ দিয়ে 'নেশন' শব্দটিতে সাড়া পান না রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তার নামে শিক্ষিত ভদ্রজনের সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন বড়ো তুচ্ছ মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।" আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করলেও বিদ্যাদান থেকে শুরু করে জলদান পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তির উপর। ফলে এসকল কাজ এমনভাবে সমাজ সম্পন্ন করেছে যে নতুন নতুন শতাব্দীতে নতুন নতুন রাজার শাসন আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও আমাদের ধর্ম নষ্ট করে পশুতে পরিণত করতে পারেনি, সমাজ নষ্ট করে আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করতে পারেনি। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাই তিনি লিখেছেন— "রাজায় রাজায় লড়াইয়ে অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।"

এই কারণে আমাদের দেশের সমাজ বা জনসাধারণ রাজার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়— যার বিপরীতটা পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এদেশে সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপর আশ্চর্যরূপে বিচিত্রভাগে ভাগ করে দেওয়া আছে। তাই পাশ্চাত্য দেশে রাজশক্তি বিপর্যস্ত হলে যেমন সমস্ত দেশের বিপর্যয় নেমে আসে আমাদের দেশে তেমনটা ঘটে না। ভারতবর্ষের রাজশক্তি তাই যুগে যুগে বহিঃশক্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত হলেও পল্লীগুলিতে সমাজ তার আপন গতিতে বহমান থেকেছে। আমাদের দেশে সমাজ নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন সত্তাকে বহন করে চলে। সে নিতান্ত নিষ্কর্মা হয়ে সকল দায়িত্ব স্টেটের হাতে তুলে দিয়ে বসে নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রকাশিত হবার পর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র এর বিরূপ সমালোচনা করে এটিকে 'আকাশ কুসুম রচনা' বলে উল্লেখ করেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে অধিক কাব্যিকতার প্রকাশ দেখে এটিকে 'একটি সামাজিক কবিতা' বলে ব্যঙ্গ করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামীও প্রবন্ধটির সমালোচনা করে বেশকিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন— যার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনামাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটিকে 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম খসড়া' হিসেবে নির্দেশ করেন। জানান—

> "আজকাল আমরা গ্রামসংস্কার বা পল্লীসংগঠনের কথা শুনি, তাহার সূত্রপাত যে এইখানেই, সেকথা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে হিন্দু মেলার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহার শৈশবে হিন্দুমেলার যে আদর্শ গুণেন্দ্রনাথ-

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা সে যুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারিতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময়ে মুদ্রিত হয়।"[১]

পরাধীন দেশে সরকারের সাহায্য ছাড়াই স্বায়ত্ত্বশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ তথা পল্লীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের অধিনায়কত্বে একটি কর্তৃসভা স্থাপনের কথা বলেছেন। এই কর্তৃসভা পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকারসমস্যা সমাধানের কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং সকলেরই বাধ্যতামূলক সহযোগিতা দাবি করতে পারবে। হিন্দু ও মুসলমানকে, শহরবাসী ও পল্লীবাসীকে এই কাজের ক্ষেত্রে এনে একত্রে সম্মিলিত করতে হবে।

এই ব্যবস্থা রুশ শাসনাধীন জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে। শাসকের উপেক্ষা ও নিষ্ঠুর উদাসীনতার বিকল্প হিসেবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রামপরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

> "জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরা কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি।"[২]

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আত্মশক্তির সাধনা সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড দাবি করে। তাই ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব পরিসর বা অটোনমির আদর্শ 'স্বদেশী সমাজ' তত্ত্বে গুরুত্ব পায়নি। সেখানে যে 'এক' এর কথা বলা হয়েছে, তা 'বহু'র সমন্বয়ে নির্মিত একক, ব্যক্তি-একক নয়। এই 'এক' চরিত্র সম্পন্ন (composite), অখণ্ড (monolithic), নয়। তার বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বন্ধন যান্ত্রিক নয়, আইন ও প্রশাসনের গিঁট তাদের বেঁধে রাখেনি। অ্যারিস্টটলের 'পোলিস্' (polis) এর মতো স্বদেশী সমাজ বিভিন্ন পেশা এবং নানা ধরণের ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। তার 'খণ্ড' গুলির মধ্যে আদান-প্রদান আছে, দ্বন্দ্ব নেই; বোঝাপড়া আছে, কাড়াকাড়ি নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ লক-হেগেল-মার্কস-গ্রামস্চি বর্ণিত ও বিশ্লেষিত সিভিল সোসাইটি নয়। এই সমাজ রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন দ্বন্দ্বও নেই। 'স্বদেশীসমাজ'কে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় 'সম্মতি' (consent) বা বলপ্রয়োগের বৈধতা উৎপাদনের ক্ষেত্রও বলা যায় না। স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাদের অবস্থান সমান্তরালতা ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত অবস্থান নয়।

স্বদেশের কর্মভার যদি স্বদেশীয়রা গ্রহণ করে তাহলে গবর্মেণ্টের অফিস এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে না। আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি অপেক্ষা পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের উপর রবীন্দ্রনাথ তাই অধিক জোর দিতে চেয়েছিলেন। এই কর্মক্ষেত্রে যে কর্মসংস্থান ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয় তা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যেমন পরিপুষ্ট করে তেমনি দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের ভিতকেও শক্ত ভিত্তি দান করে থাকে। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পল্লীগুলিতে কীভাবে একটি সুলভ সহজ

বিচারব্যবস্থাও গড়ে তোলা যায় রুশীয় গভর্মেন্টের অধীনস্থ বল্গীক প্রদেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে বৃটিশ-ভারতের সংবিধান প্রসূত প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। আজকের দিনে সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রের যে বিপুল সংকট, তার যে ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথের এই না-সমর্থনেরই ফলপরিণাম।

যদি বিচার করা হয় ভারতে এই মুহূর্তে গণতন্ত্র রয়েছে কাদের? প্রশ্নটা আর একটু সহজ করে নেওয়া যাক। কোন কোন শ্রেণিগুলি নিজ নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় তাদের কার্যকলাপ চালাতে পারে? এই যেমন অধিক মুনাফার লক্ষ্যে গাড়ি কারখানার জন্য টাটার দরকার ছিল সিঙ্গুরের জমি ও সহকারি সহায়তা। আর কৃষক চেয়েছিল তাদের বহুফসল জমির অধিকার বজায় রাখতে। অনেকে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে সিঙ্গুরে জমির চরিত্র বদল হয়ে কারখানা গড়ে ওঠাটা অর্থনীতির পক্ষেও ক্ষতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র কাকে সাহায্য করেছিল?

একইভাবে বলা যায় যে, ভারতে বড় বাঁধ যে পরিমাণে গড়ে উঠেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলের পরিমাণ। কিন্তু তাতে কি নর্মদার উপর বাঁধ আটকানো গেছে? একইভাবে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় সহ গোটা মধ্য ভারতেই প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে কর্পোরেট পুঁজিকে সহায়তা দিতে রাষ্ট্র জনগণের কোন অধিকারকেই মান্যতা দিতে প্রস্তুত নয়। এই সমস্ত ঘটনাবলীর উপর নজর রেখে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই বলা যায় ভারতে গণতন্ত্র রয়েছে সেইসব বিদেশী কর্পোরেট সংস্থার যারা নিয়মিত শোষণের পাশাপাশি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে জল-জঙ্গল-জমির উপর দখল নিতে চাইছে, কোটি কোটি মানুষের জীবিকা বিপন্ন করে খুচরো ব্যবসার দখল নিতে চাইছে, গণতন্ত্র রয়েছে সেসব দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের যারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবা করার মাধ্যমেই নিজেদের পুষ্ট করে।

আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রকে আজ ঠিক কতটা বিপন্ন করে তুলেছে? ভোটবাক্সে 'গণ'-এর মতামত প্রতিফলিত হবার আগেই সাধারণ মানুষ যে হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, হুমকি, পাল্টা-হুমকি, খুন, ধর্ষণের ঘৃণ্য দলীয় রাজনীতির শিকার হয় তারপরেও কোন সাহসে বা ভরসায় তারা ভোটকেন্দ্র অবধি নিজের পরিবারের লোকজনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বা নিজে এগিয়ে যাবে? ফলে ছাপ্পা, ভোট-লুঠ দেশে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে বললে খুব বেশি ভুল বলা হয় না। এই বিপন্নতাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে নিষ্ক্রিয় প্রশাসনের নিঃশব্দ মদত, ভোটযজ্ঞে স্বার্থপুষ্ট অসাধু কর্পোরেট সংস্থাগুলির অর্থের নিভৃত যোগান।

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের চাইতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন— যা প্রাচীন গ্রীস বা ভারতে পূর্বে বর্তমান ছিল। চেয়েছিলেন এদেশের বৃটিশ প্রশাসনিক খোল-নলচেটাকেই আমূল পালটে দেশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দানের জন্য। তাঁর গ্রাম-সমাজ বা 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনা সে দিকেরই ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সকল মানুষের বিচিত্র অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সে গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র এক রূপ। স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যে সকল কথা বলেন তার মধ্যে এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। সেখানে সকল 'গণ'ই সমান মর্যাদা পায়, সকলেই প্রশাসন বা নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থার উজ্জীবন ঘটিয়ে স্বাবলম্বী ও গণতন্ত্র সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই গ্রাম-সমাজ রাষ্ট্রের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না আবার রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হয় না। রাষ্ট্রের সমান্তরালে গণতান্ত্রিকতার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। পুঁজিশাসিত বিশ্বায়নের স্রোত সেখানে উন্নয়নের মানবিক মুখকে বিসর্জন দিতে পারে না।

এ জাতীয় গ্রাম-সমাজ পরিকল্পনাকে কেউ কেউ বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা এক 'সর্বনাশা কল্পনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ একে 'Utopian' বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনে সংস্কারমূলক অর্থনীতিতেও শুনি রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় অর্থনৈতিক চিন্তার স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতাকে। বাজারের বিপরীতে পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়া 'সর্বনাশা কল্পনা' হ'তেই বাধ্য— এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়; 'সর্বনাশা কল্পনা' নয় এটি। আস্থা রাখতে হবে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর। যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ এমন একটা সমাজ গড়তে পারবে যেখানে বাণিজ্য চক্রের মার নেই, নিয়োগহীনতার সমস্যা নেই এবং সামাজিক উৎপাদনের বন্টনে অসাম্য নেই। 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই ধরণের কথা বলেছিলেন আইনস্টাইন, যাঁর মেধার মান নিয়ে আজও কোনো প্রশ্ন নেই।

কথাটা সঙ্গত কথা। উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষ এরকম একটা সমাজ গড়বে এই প্রত্যাশা ইদানীং ক্রমবর্ধমান। কেননা বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে ব্যক্তিমানুষের বিপন্নতা। প্রত্যাশা যত বাড়বে, এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদও তত বাড়বে। সমাজ এরকমই, এরকম সমাজ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। 'spontaneous developed order'-এর কাছে নতজানু হয়ে বাজার মৌলবাদীদের হাতে ভাগ্য সঁপে দিতে হবে— দেশে দেশে ক্রমশ বাড়ছে এই চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গড়ে উঠছে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সামাজিক সংগঠন। একবিংশ শতকে সমাজতন্ত্র এখন রীতিমত চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে সর্বত্র। সোভিয়েতের পতনের সাথে সাথে মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদকে কবরে পাঠানো যায়নি। এটাকে গুরুত্ব দেবার কোনো দরকার নেই— উন্নাসিক বাজার-মৌলবাদীরা এরকম ভাবলেও বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির ন্যায্যতা রক্ষার সমস্যা যে বাড়ছে, লিবারেল মতবাদের বাজারপন্থীরা এটা বিলক্ষণ বুঝেছেন। সেইজন্যই তাঁরা রলস্-এর 'সামাজিক ন্যায়'-এর তত্ত্ব আর বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কেইনসীয় তত্ত্ব ফিরিয়ে এনে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতিতে একটা মানবিক মুখ প্রোথিত করার চেষ্টা করছেন এতটা গুরুত্ব দিয়ে। আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে বড্ড বেশি রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃ. ১৪৭।
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃ. ৬৭৯-৬৮০।